যায়যায়দিন
তারিখ 08 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

ক্যাম্পাসে লাশ পড়েছে ১৪টি বিচার হয়নি একটিরও

গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস বাকৃবি

স্বাধীনতা পরবর্তী গত ৩৪ বছরে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সৃষ্ট সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ১৪ শিক্ষার্থী। প্রতিটি সংঘর্ষ ও অঘটনের পর একটার পর একটা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। তবে কোনো হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি। সুরাহার বদলে তদন্ত কমিটিগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে বারবার।

অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের ঘটনাও ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ছাত্রছাত্রীরা দাবি নিয়ে আন্দোলন হলেই তা রূপ নেয় ভাংচুরে। ফলে সৃষ্ট সহিংসতায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের খেসারত গুণতে হয়েছে কড়ায়-গণ্ডায়। ১৯৭১-এর পর থেকে ৩৪ বছরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের কারণে বন্ধ ছিল প্রায় চার বছর। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন, সাধারণ ছাত্র ও পুলিশ এবং কর্মচারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে শতাধিক বার।

বাকৃবিতে প্রথম হত্যাকাণ্ডটি ঘটে ১৯৭৩ সালে। কর্মচারী-শিক্ষক-ছাত্র সংঘর্ষে নিহত হয় রঞ্জিত নামের এক ছাত্র। এ অঘটনের সময় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রায় এক মাস বন্ধ থাকে। এরপর থেকে শুরু হয় হত্যার রাজনীতি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ১৯৮৩ সালে। রাজনৈতিক কোন্দলের জের ধরে চার শিক্ষার্থী প্রাণ হারায় বুলেটের আঘাতে। এ নরকীয় হত্যাকাণ্ডের সূচনা ঘটে ১১ জানুয়ারি প্রতিপক্ষের গুলিতে ছাত্রদল বাকৃবি শাখার প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক এ টি এম খালেদ নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে। ওই ঘটনার জের ধরে পরদিন ১২ জানুয়ারি ছাত্রলীগ ও বাকসুর তিন নেতা শওকত, ওয়ালী ও মহসিনকে প্রথমে বেধড়ক পিটিয়ে ও পরে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লে প্রায় পাচ মাস ক্যাম্পাসের কার্যক্রম স্থগিত থাকে।

১৯৭৭ সালে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা ডি-গ্রেড করে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা করার প্রতিবাদে ছয় মাস বন্ধ থাকে বাকৃবি।

১৯৮২ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের প্রতিবাদে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে মেতে ওঠে। ক্ষমতা গ্রহণের পর এরশাদ সরকার জোরপূর্বক শিক্ষার্থীদের হল থেকে বের করে প্রায় পাচ মাস বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ রাখে। এরশাদ সরকারের আমলে ৫ দফায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল প্রায় আট মাস।

১৯৯৩ সালে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ২৪ জানুয়ারি রেজাউর রহমান সবুজ নামে এক ছাত্রদল কর্মী নিহত হয়। এরপর নেতৃত্ব, আধিপত্য, সিট দখল, বাজেট বণ্টন, টেন্ডার দখলের ঘটনার পাশাপাশি আরো কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনায় ছাত্রদলের গ্রুপিং সংঘর্ষের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ থাকে প্রায় দুই মাস।

১৯৯৪ সালে ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্ররোচণায় কর্মচারীদের সঙ্গে সাধারণ ছাত্রদের সংঘর্ষে এক কর্মচারীর কলেজ পড়ুয়া ছেলে গাজী নিহত হয়।

১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে বাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের ব্যাপক সংঘর্ষে শতাধিক রুম ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। একই বছরের ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর ছাত্র শিবির বিশ্ববিদ্যালয়ে শাহজালাল হল, জামাল হোসেন হল ও ঈশা খা হলে উত্তেজনাকর স্লোগান দিলে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। আর এ মুখোমুখি সংঘর্ষের কারণে সে সময় আলাউদ্দিন, শওকত হোসেন তালুকদার, মঞ্জুরুল কবির ও হাসান জহির নামে ৪ শিবির কর্মী খুন হয়।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ চলে প্রায় ছয় মাস। এ সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে ৯ নভেম্বর বন্দুকধারীদের গুলিতে কো-অপারেটিভ মার্কেটে কামাল ও রঞ্জিত নামে দুই ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হয়। এ ঘটনায় ছাত্রদলের ১১ জনকে বহিষ্কার করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আদেশে।

২০০১ সালের ১ অক্টোবর চারদলীয় জোটের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর ছাত্রলীগ স্বেচ্ছায় ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। শুরু হয় ছাত্রদলের একক আধিপত্য বিস্তার। এর পরপরই ছাত্রদল খালিক, বিপ্লব, শফিক ও হাসু এ চার গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ওই বছরেরই ২৩ নভেম্বর রাতে হাসু গ্রুপের লিডার রেজাউল করিম হাসু ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সন্ত্রাসীদের গুলিতে লাশ হয়। সর্বশেষ এ হত্যাকাণ্ডের রেশ এখনো কাটেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের ঘৃণ্য চক্রান্তের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের আরেকটি বড় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে। এ সময় ছাত্র-শিক্ষকের সঙ্গে পুলিশ ও ছাত্রদলের সংঘর্ষে ছাত্র-শিক্ষকসহ শতাধিক আহত হয়। এরপর ২০০৩ সালের ৭ এপ্রিল সেমিস্টার সংশোধনের দাবিতে আন্দোলনের সময় ছাত্রছাত্রীরা ব্যাপক ভাংচুর করে। সেমিস্টারের ব্যস্ত সময়গুলোর মধ্যে এখনো এসব ঘটনা ছাত্রছাত্রীদের ভাবিয়ে তোলে। যখন তারা দেখে এতো প্রাণ লাশ হয়ে ঘুমিয়ে আছে অথচ আজ পর্যন্ত কোনো একটিরও বিচার হয়নি।

এই অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো নিয়ে বাকৃবি চিফ সিকিউরিটি অফিসার মহিউদ্দিন হাওলাদারের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন- প্রত্যেকটা হত্যাকাণ্ডের পর মামলা হয়েছে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে এবং আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। কিন্তু আদালত চায় সাক্ষী ও প্রমাণ। যারা মামলা করেছে অদৃশ্য কারণে তাদের সাক্ষী হিসেবে পাওয়া যায় না কোর্টে। ফলে ঝিমিয়ে পড়ে বিচার কার্য।

জানা গেছে, নিহত আত্মীয়-স্বজনদের কারো কারো কর্মসংস্থান করে দেয়া হয়েছে বাকৃবিতে। এর বেশি কিছুই হয়নি। তবে সাধারণ শিক্ষার্থীরা মনে করছে প্রত্যেকটা অঘটনের দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বাস্তবায়ন করতে পারলে নিরীহদের মনে স্বস্তি আসবে। নতুবা এ ধরনের অপরাধ ঘটতে থাকবে, বিচার হবে না আর আতঙ্কও কাটবে না।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিটি সংঘর্ষ ও অঘটনের পর একটার পর একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। তবে কোনো হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি। সুরাহার বদলে তদন্ত কমিটিগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে বারবার